বর্ণাশ্রম ধর্ম

বর্ণাশ্রম ধর্ম হল ধর্মকেন্দ্রীক বর্ণব্যবস্থা। বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম ধর্মের মিলিত রূপই হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থার ভিত্তিরূপে যে বর্ণাশ্রম প্রথার কথা বলা হয় তা ধর্মকেন্দ্রীক। তবে ধর্ম বলতে সাধারণত যা বোঝায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ধর্ম' কথাটি সেরকম নয়। পুরুষার্থের অর্ন্তগত প্রথম পুরুষটি হল ধর্ম। যদিও মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়, তাহলেও ধর্ম মোক্ষ লাভের সহায়ক হয়। আর সে কারণেই পুরুষার্থের পরিকল্পনায় ধর্ম হল প্রধান ভিত্তি। পাশ্চাত্য চিন্তায় Religion বা 'ধর্ম' কথাটি ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বর অনুসারী কিছু বিশেষ আচরণকে বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ধর্ম' বলতে সদাচার, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অণুসরণ ও পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। ধর্মের নিয়ন্ত্রণ মানুষের নৈতিক জীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত করে এবং পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলাকে ধরে রাখে।

ইংরেজী Religion শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ‘ধর্ম’ কথাটি ব্যবহার করা হলেও : ‘ধর্মজ্ঞ কথাটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এক বিশেষ অর্থ আছে। ‘ধৃ’ ধাতুর সাথে ‘মন্’ প্রত্যয় করে ‘ধর্ম’ শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ‘ধৃ’ ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা। অর্থাৎ যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই হল ধর্ম। হিন্দুধর্মে তাই বলা হয়েছে, যার দ্বারা নিজের ও অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তৃত হয়, তাকেই ধর্ম বলে। ভারতীয় দর্শন চিন্তায় ধর্ম ও সত্যকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। আচার্য মনুর মতে, হিংসা বা অন্য কোন উপায়ে কাউকে ধর্ম পালন করতে বাধ্য করা অনুচিত। কাজেই ধর্ম যেমন সত্যের সাথে অভিন্ন তেমনি তা অহিংসাও।

তাই ‘ধর্ম’ সত্য, কল্যাণকর, ও অহিংস, অভিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। ‘ধর্মে’র এই স্বরূপ মনুসংহিতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মনু বলেছেন, অন্যকে আঘাত না করে, সত্য কথা বলা, অপ্রিয় কথা না বলা এবং অপ্রিয় সত্য না বলা। আবার প্রিয় হলেও মিথ্য কথা বলা উচিৎ নয়। আর এগুলিই ভারতীয় সনাতন ধর্মের কথা। ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে - ‘ধারন বা ধৈর্য্য, ক্ষমা, সৎ আচরণ, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বা শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ - এই দশটি হল ধর্মের লক্ষণ’।

ভারতীয় শাস্ত্রে দু-প্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এদের একটি হল সাধারণ ধর্ম এবং অপরটি বিশেষ ধর্ম। বিশেষ ধর্মকে 'স্বধর্ম' বলা হয়। সাধারণ ধর্ম হল কতকগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়মের নির্দেশ যা সকল মানুষের অবশ্যই পালনীয়। সাধারণ ধর্মের অনুসরণ সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সহায়ক হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ইত্যাদি হল সাধারণ ধর্ম। নিজের নিজের ধর্ম অনুসারে ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে আচরণ করাই হল স্বধর্ম। যেমন, যজন-যাজন ও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের স্বধর্ম, সামাজিক কল্যাণের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। বেদে বর্ণ অনুযায়ী যে কর্মের নির্দেশ আছে তাই স্বধর্ম। স্বধর্ম বলতে বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম ধর্মকে বোঝায়, অর্থাৎ স্বধর্ম হল বর্ণাশ্রম ধর্ম।

আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ ব্যবস্থা লক্ষ্য করি তার ভিত্তি হল প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত বর্ণব্যবস্থা। 'জাত' শব্দটির নিকটবর্তী শব্দ হল 'বর্ণ'। বস্তুত প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতির পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করা হত। ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্তের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রজাপতি ব্রহ্মাই হলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণের সৃষ্টিকর্তা। সেই বিরাট পুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, তাঁর বাহুস্বরূপ হলেন ক্ষত্রিয়, উরু হলেন বৈশ্য ও পদযুগল হলেন শুদ্র। শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণ ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন। বর্ণের এই বিভাজন সমাজে বসবাসকারী মানুষের গুণ ও কর্মের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট। বর্ণ অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাজন মানুষের কল্যাণ ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন।

সাংখ্য দর্শনে সত্ত্বঃ, রজ ও তম - নামক তিনটি গুণের স্বীকার করা হয়েছে। এই ত্রিবিধ গুণের বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির অন্যসব কিছুর মত মানুষও এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। তবে মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ সমভাবে থাকে না। কেউ সত্ত্ব গুণ প্রধান, আবার কোন মানুষের মধ্যে রজঃ গুণের প্রাধান্য, আবার কারুর মধ্যে তমঃ গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গুণের এই প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তির বর্ণ ও কর্ম পৃথক পৃথক হয়। সত্ত্ব গুণ হল স্বচ্ছ ও বুদ্ধি প্রধান। মানুষের মধ্যে চিন্তার স্বচ্ছতাহেতু সত্ত্বগুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। চিন্তার স্বচ্ছতার কারণেই ব্রাহ্মণদের পূজাপাঠ, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয়। রজঃ গুণ চঞ্চল, শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের প্রতীক।

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রজঃ গুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রজাপালন ও সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার ভারতীয় শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দের ওপর ন্যস্ত করেছে। তমঃ গুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলস। ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে শুদ্রদের মধ্যে তমঃ গুণের আধিক্য থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদিদের সেবা করার কাজ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইভাবে দেখলে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন গুণ ও কর্মের সমাবেশের দ্বারা সমাজদেহ গঠন করেছেন। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় জন্মসূত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। যা একদিকে যেমন কর্ম অনুযায়ী সামাজিক জীবিকাকে সুনির্দিষ্ট করে, তেমনি সেই কর্ম গুণ অনুসারী হওয়ায় কর্মের দক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থা ধর্মের গোঁড়ামির দ্বারা চালিত হয় নি। বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধর্ম হলেও তা এক বিশেষ ধর্ম। এই ধর্ম হল গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষ কিভাবে নিজ নিজ কর্ম করে ও নিজ গুণে অবিচলিত থেকেও ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা। আদিম অবস্থায় মানুষের মধ্যে সমাজের ও পরিবারের ধারণা না থাকায় তাদের মধ্যে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী বৃত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু কালক্রমে মানুষ সমাজবদ্ধ হল। পরিবার গঠন করল। এই অবস্থায় গড়ে উঠল সমাজ, সামাজিক জীবন।

মানুষ পারিবারিক সামাজিক জীবন যাপন করতে গিয়ে উপলব্ধি করল তার প্রয়োজনের সব কাজ তার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সমাজের সব মানুষকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করল। যার দ্বারা সমাজের প্রত্যেক মানুষের কর্ম ও বৃত্তিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। সূচনা হল ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার। সুতরাং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার দ্বারা যে সামাজিক বিভাজন তা মানুষের নিজের স্বার্থে কৃত্রিম বিভাজন, যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি স্থান পায় নি। ধর্মীয় গোঁড়ামি না থাকার কারণে প্রাচীন হিন্দু সমাজের বর্ণ ব্যবস্থা কখনই নিশ্চল ছিল না। ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হয়েছে, তেমনি ক্ষত্রিয়ও উন্নীত হয়েছে ব্রাহ্মণত্বে। ভারতীয় শাস্ত্রে সকল বর্ণকেই মানববর্ণ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমগুণ থাকলেও সব মানুষের মধ্যে এই সবকটি গুণ সমানভাবে ছিল না। গুণের পার্থক্য হেতু ব্যক্তির কর্ম করার সামর্থ্য একই মাত্রায় থাকে না। সুতরাং গুণ অনুযায়ী কর্মের বিভাজন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ভগ্দগীতায় বলা হয়েছে ঃ যম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণদের স্বভাবগত ধর্ম। শৌর্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপারংমুখতা, দানে মুক্তহস্ত, ঈশ্বরভাব হল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবগত ধর্ম। আর পরিচর্যা বা সেবা হল শুদ্রের স্বভাবগত ধর্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অবস্থার জন্য দায়ী হলেও ব্যক্তি তার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে সমাজে উচ্চতর স্থান লাভে সমর্থ হতে পারে। প্রত্যেককেই তার স্বধর্ম পালন করা বিধেয় বলে শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে।

বর্ণাশ্রম ধর্মের আর একটি দিক হল আশ্রম ধর্ম। বৈদিক শাস্ত্রে মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস - চারটি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে। 'শ্রম' ধাতু থেকে আশ্রম শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ পরিশ্রম করা। সাংসারিক জীবনের পূর্ববর্তীকাল হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন শাস্ত্র অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে, তেমনি অভ্যাস করবে সংযমের, যা পরবর্তী জীবনে তাকে বিশুদ্ধ চিন্তা করতে সাহায্য করবে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম পর্বে শিষ্য গুরু গৃহে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করত। গুরুর সেবার মধ্যে গুরুকে সন্তুষ্ট করে গুরুর কাছ থেকে অর্জন করত সকল প্রকার বিদ্যা। ভিক্ষান্ন গ্রহণের দ্বারা সে জীবন-যাপন করত। এইভাবে কঠোর আত্মসংযমের সূচনা হত। গুরুগৃহে সূচিতা, সরলতা, কর্মতৎপরতা, সংযম, তিতিক্ষা প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা তারা সুস্থ শরীর ও মনের অধিকারী হত। এইভাবে তারা নিজেকে ভাবী গার্হস্থ জীবনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হত।

আশ্রম ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রমটি হল গার্হস্থ আশ্রম। গার্হস্থ আশ্রমকে অন্য সব আশ্রমের আশ্রয়স্থল বলা হয়। ঘৃণা, অহঙ্কার, গর্ব, রূঢ় বাক্য বাবহার, হিংসা ত্যাগ করে সদাচার ও সদালাপী জীবন-যাপন করা গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থলে নানা যাগযজ্ঞ করতে হয়। ঋষিযজ্ঞ,, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহস্থকে ঋষি, দেবতা, পূর্বপুরুষ, মানুষ ও ইতর প্রাণীর ঋণ শোধ করার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

বাণপ্রস্থ সন্ন্যাস জীবনের প্রস্তুতীপর্ব। সন্ন্যাস জীবনের প্রস্তুতী পর্ব হিসাবে এই আশ্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি, শষ্য গ্রহণ, কুনাতৃন বস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা বিধেয়। দেবতা ও অতিথিদের সেবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করা বানপ্রস্থবাসী ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম। বানপ্রস্থে কঠোর আত্মসংযমের মাধ্যমে আগামী সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মায়।

আশ্রম ধর্মের চতুর্থ ও শেষপর্ব হল সন্ন্যাস আশ্রম। সন্ন্যাস হল ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ। বাণপ্রস্থ আশ্রমের মধ্য দিয়ে আত্মসংযম ও বৈরাগ্যের অনুশীলন সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। সন্ন্যাস আশ্রমে দেহ থাকলেও দেহ অনুসারী মায়া, মোহ, কামনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জাগতিক লাভ লোকসান তাকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। কায়িক, বাচিক ও মানসিক হিংসা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর ধর্ম। সন্ন্যাস আশ্রমে জীব আত্মনিমগ্ন থেকে শাস্ত্র চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম এমন কতকগুলি বিধি-বিধান ও কর্তব্যের নির্দেশ দেয় যা সকল মানুষের অবশ্য পালনীয় এবং যা পালন করলে সামাজিক কল্যাণ ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হয়। ভারতীয় হিন্দু সমাজে যে বর্ণভেদ প্রথা আজও বর্তমান তা সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী হলেও তার সাথে বর্ণাশ্রম ধর্মের কোনযোগ আছে বলে মনে হয় না। আসলে বর্ণাশ্রম ধমর্রে প্রচলন সমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্য। যা প্রত্যেক মানুষের আপন ধর্ম অনুযায়ী বিকশিত করবে, আবার প্রগতিও সূচিত করবে। এই কল্যাণ কোন বিশেষ দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ নয়। সকল মানুষ ও সকল দেশের পক্ষে কল্যাণকর। ধর্মের মূল নিয়মগুলি কোন সম্প্রদায়ের বা কোন দেশ-কালের জন্য নয়; সকল দেশ ও সকল কালে, সব মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলে এই ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। এতে চারি ধর্ম ও চারি আশ্রম আছে বলে এর নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ